Vol. 34 | No. 1 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ (কণিকা-কথা-কাহিনী)

Volume	34
Issue	1
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	October 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v34i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i1.1
Pages	1-20
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্র–কাব্যপাঠ

[কণিকা–কথা–কাহিনী]

সৈয়দ আলী আহসান

একজন কবি বিভিন্ন সময়ে কবিতা রচনা থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করেন, কিন্তু বিশ্রামটি কর্মহীন বিশ্রাম হয় না। বিশ্রামের সময়ও লঘুভাবে কিছু রচনা করতে চান, অতি সাধারণ বস্তুকে স্পর্শ করে আনন্দিত হতে চান। রবীন্দ্রনাথ যখন 'কণিকা' রচনা করলেন তখন তিনি কাব্যকর্ম থেকে কিছুটা অবসর নিয়েছিলেন মনে হচ্ছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী'তে উল্লেখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ যখন 'কণিকা' রচনা করেন তখন মূলত তিনি কাব্য হিসেবে কিছু লিখছিলেন না, লিখবার প্রেরণাও তাঁর ছিল না। জমিদারী ও ব্যবসা সংক্রান্ত নানাবিধ জটিলতার মধ্যে তিনি তখন ছিলেন। সে সব কিছুর হিসেব–নিকেশ করা, পুত্র বলেন্দ্রনাথের পীড়াজনিত উদ্বেগ, পুত্র–কন্যাদের জন্য শিলাইদহে শিক্ষার ব্যবস্থা করা কবির শরীর ও মনকে ক্লান্ত করেছিল। এ সময় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন রচনায় হাত দেননি। এ সময় মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ কোন আবেগ আমরা লক্ষ্য করি না।'কণিকা'র কবিতাগুলো তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। ঠিক কবিতা যাকে বলে, যার মধ্যে কবির বিশ্বাস, উপলব্ধি, স্পর্শকাতরতা এবং আবেগ ধরা পড়ে, এগুলোর মধ্যে তার কিছুই নেই। এগুলো ছন্দোবদ্ধ সারগর্ভ ভাষণ। যে সমাজে এবং সংসারে কবি তখন বাস করছিলেন এবং ব্যবসায় ও জমিদার বৃত্তির কর্মকাণ্ডে যে সমস্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলোর উপর ভিত্তি করে 'কণিকা'র বক্তব্যগুলো লিখিত হয়ে–ছে। 'কণিকা'র মধ্যে বিদ্রূপ আছে, পরিহাসদীপ্ত উক্তি আছে এবং সামাজিক অভি–জ্ঞতার নির্মম দাহন আছে। বলা যেতে পারে, যে কথাগুলে আমাদের সকলেরই জানা, অথচ ঠিকমত বলতে পারছি না সেই কথাগুলোই উপমা, রূপক এবং

শ্লেষের সাহায্যে কবি প্রকাশ করেছেন। এগুলো মূলতঃ 'এপিগ্রাম'– এর মত। 'এপিগ্রাম' এ একটি আকস্মিকতা থাকে এবং একটি বিস্ময় সৃষ্টির চেষ্টা থাকে। 'কণিকা'র কবিতাগুলোর মধ্যে আমরা তার পরিচয় পাই।

'কণিকা'র প্রথম কয়েকটি কবিতা পাঠ করলে বোঝা যাবে যে, কবি অত্যন্ত সুচতুর নৈপুণ্যে প্রতিটি কবিতার শেষের দুই চরণে একটি চমক সৃষ্টি করেছেন। এটাই এক ধরনের আকস্মিক বিস্ময়। যেমন 'যথার্থ আপন' কবিতাটি অথবা 'শক্তির 'সীমা' আথবা'অকর্মার বিভ্রাট' অথবা 'কীটের বিচার' এগুলোতে কবির কাব্যভাবের বিশেষ কোন প্রকাশ নেই। নিম্নের উদাহরণগুলো দেখলেই বোঝা যাবে এ রচনাগুলো কত দুর্বলঃ

১. সহিসের হাত হতে দাও অব্যাহতি
দলন –মলনটার বাড়াবাড়ি অতি।
(নতুন চাল)

২. আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার,
আগাগোড়া কেটেকুটে করি ছারখার।
(কীটের বিচার)

৩. মনিবের পাতে ঝোল খাবে চুক্‌চুক্‌
বিশ্বে শুধু নড়িবেক তারি লেজটুকু।
(ঈর্ষার সন্দেহ)

৪. হল, বলে, ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে–
খাটুনি যে ভালো ছিল জুলুনির চেয়ে।
(অকর্মার বিভ্রাট)

৫. মাটির ভিতরে তার দখল প্রচুর
প্রত্যক্ষ প্রমাণে জিত হইল কচুর।
(অধিকার)

উপরের উদ্ধৃতিগুলোতে মিলের বিন্যাস এবং শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত দুর্বল এবং লঘু। 'কণিকা'র অনেক পরে প্রকাশিত 'লেখন' কাব্যগ্রন্থটি তুলনায় অনেক উন্নত এবং দীপ্তিময়। 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কণিকা' সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ নয়। তিনি সেখানে বলেছেন যে, 'কণিকা'র কবিতাগুলোতে কবির সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম কবিতাটি পাঠ করলেই বোঝা যাবে যে, তার এই উক্তি কতটা অযথার্থ। কবিতাটিতে

বলা হচ্ছে যে, একটি কুমড়ো গাছের ডালে ঝুলছিল। সে ভাবছিল ডাল থেকে ছুটতে পারলেই সে উড়ে সূর্যের কাছে চলে যাবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, সে ডাল থেকে ছিঁড়ে আকাশে উড়ল না, মাটিতেই পড়লো। এই বক্তব্যের মধ্যে মহার্ঘ কোন ভাষণ নেই, বিশিষ্ট কোন চতুরতাও নেই। তবু এই কাব্যগ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের কবি–জীবনে এ কারণেই উল্লেখযোগ্য যে, 'চিত্রা' এবং 'চৈতালি'র পর নতুন একটি বলিষ্ঠ ভাবধারায় উপনীত হবার জন্য 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থটির প্রয়োজন ছিল।

'কণিকা'র কবিতাগুলো কাব্যভাবের দিক থেকে যত দুর্বলই হোক না কেন এগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ জীবনের কিছু স্মৃতিচিহ্ন ধরা পড়েছে। গ্রামের কৃষকদের বাড়িঘর, চাষাবাদ, গৃহের তৈজসপত্র, খাদ্য তালিকাভুক্ত ফলমূল এগুলোর কথা কবিতাগুলোতে ফুটে উঠেছে। যে গ্রামীণ জীবনকে তিনি অবলোকন করেছিলেন এবং যার চিত্ররূপময়তা তাঁর ছোটগল্পে পরিস্ফুট হয়েছিল খণ্ড ক্ষুদ্রভাবে তার কিছু কিছু চিত্র *'কণিকা'র* কবিতাগুলোতে পাওয়া যায়। গৃহস্থ বাড়ির আঙ্গিনায় লতানো কুমড়ো গাছে ঝুলে থাকা কুমড়োর কথা আমরা পাচ্ছি, তৈজস পত্রের মধ্যে কাঁসার ঘটির শব্দ পাচ্ছি, গ্রামের পথ দিয়ে মহিষের পদচারণ দেখতে পাচ্ছি, ক্ষেতের চাষের জন্য লাঙ্গলের ব্যবহার দেখছি, মৌমাছির চাক দেখছি গাছের ডালে, টুনটুনি পাখীকে লাফাতে দেখেছি এদিক ওদিক, *মহাভারতের* কথা এসেছে, গ্রামের বৃদ্ধরা যেমহাভারত সুর করে পড়ে, গ্রামের পথে কীট পতঙ্গের ছুটাছুটির শব্দ পাচ্ছি, ছাতা মাথায় দিয়ে লোকেরা পথ দিয়ে চলছে তারও চিত্র রয়েছে, খাদ্য হিসেবে কচুর কথা এসেছে, গৃহস্থের বাড়িতে কুকুর এবং বিড়ালের কথা এসেছে। কুড়াল এবং শাল গাছের কথা এসেছে, গ্রামের বধূদের খোপা ও এলো–চুলের বিবরণ পাচ্ছি, বাড়ির চারপাশে কঞ্চির বেড়ার কথা এসেছে, মাটির প্রদীপের কথা এসেছে, গ্রামের খাল বিলের কথা এসেছে–এরকম অজস্র খণ্ডচিত্র *'কণিকা'র* মধ্যে আমরা পাই। *'কণিকা'* রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ যে গ্রামের জীবনকে নিকট থেকে লক্ষ্য করেছেন তা আমরা বুঝতে পারি। কবিতা হিসেবে না হলেও বাংলাদেশের গ্রাম্য প্রকৃতি এবং গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের একটি ইতিকথা *'কণিকা'র* কবিতাগুলোতে পাওয়া যায়। চিত্রগুলো পূর্ণাঙ্গ নয়, কিন্তু ইঙ্গিতবহ। একটি দুটি শব্দে আমরা গ্রামীণ জীবনের সুন্দর একটি ধারাক্রম পাই। ও

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *'রবীন্দ্রজীবনী'* থেকে জানা যায় যে, বাংলা ১৩০৫ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বাস করছেন। এভাবে গ্রামে থাকতে গিয়ে গ্রামের মানুষ প্রত্যহই তাঁর চোখে পড়েছে। গ্রামের মানুষের আশা-নিরাশা, কর্মের দায়ভাগ, ক্ষুদ্রতা ও অপরাধবোধের স্বভাব, ঔৎসুক্য এবং আনন্দ তাঁর গল্পগুলোতে পাওয়া যায়। এই গল্পগুলো থেকে গ্রামীণ-জীবনের কিছু শব্দ *'কণিকা'*য় ছিটকে এসেছে। রবীন্দ্র-নাথের গল্পগুলোর বিবেচনার সময় *'কণিকা'*র কবিতাগুলোর কথা আমাদের মনে আসা উচিত। প্রভাতকুমারের জীবনীগ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ এ সময় কিছু কুটির শিল্পে হাত দিয়েছিলেন। যেমন মৌমাছির চাষ, রেশমগুটির চাষ ইত্যাদি। খেলাচ্ছলে যে এগুলোতে হাত দিয়েছেন তা নয়, ব্যবসা-বুদ্ধিকেও এক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ব্যবসা বুদ্ধিতে তিনি সফলকাম ছিলেন না। ব্যবসা ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতার জন্য নিশ্চয়ই কিছু মানুষের ছল চাতুরী দায়ী ছিল। *'কণিকা'*র অনেক কবিতার মধ্যে কিছু মানুষের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গোক্তি ফুটে উঠেছে। প্রথম কবিতাটিতে বলছেন- কুমড়ো হয়তো ভাবে সে আকাশের সূর্যের কাছে যাবে। কিন্তু বোটা ছিঁড়ে সে মাটিতেই পড়ে, আকাশে ওড়ে না। এখানে কোন খল বা দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের প্রতি সুপ্ত একটি ব্যঙ্গোক্তি আছে। আমরা কবিতাগুলো ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লে কখনও ব্যঙ্গ, কখনও সমালোচনা, কখনও তীব্র জ্বালা আবিষ্কার করব। কবিতা হিসেবে *'কণিকা'*র কবিতাগুলোকে মূল্য দেবার চেষ্টা করে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি খণ্ড অধ্যায়ের চিত্রাংকন এখানে আমরা আবিষ্কার করতে পারি। একটি সময়ে তিনি যে ব্যবসা করতে গিয়ে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন সে চিত্রগুলো *'কণিকা'*র কবিতাগুলোতে পাওয়া যায়। ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যর্থতার যে অভিজ্ঞতা এবং যে অভিজ্ঞতার কারণে কবির শুভবুদ্ধি লাঞ্ছিত হয়েছিল সেই নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপের ভাষায় রূপ দিয়েছেন। ব্যবসায় ব্যর্থতা ঠাকুর পরিবারের চিরকালের ভাগ্য। কবির জ্যোতিদাদা নানা ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসা-বুদ্ধির অভাবে সবগুলোই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথেরটাও অনেকটা সেরকমই। যথেষ্ট শুভবুদ্ধি ছিল, আন্তরিকতা ছিল, গ্রামের মানুষকে স্বাবলম্বী করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সম্ভবত লোকচরিত্র না বোঝার কারণে ব্যর্থতা এসেছিল। *'অপরিহরণীয়'* নামক চার পঙক্তির একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যথার একটি চিত্র এঁকেছেন-

মৃত্যু কহে, পুত্র নিব; চোর কহে, ধন।
ভাগ্য কহে, সব নিব যা তোর আপন।
নিন্দুক কহিল, লব তব যশোভার।
কবি কহে, কে লইবে আনন্দ আমার?

*'কণিকা'*র পরপরই যে কাব্যগ্রন্থটি আমাদেরকে বিশেষভাবে আনন্দ দেয় সেটির নাম *'কথা'*। রচনাবলী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা–সূত্রে যে কথাগুলো বলেছেন, তাহলো:

> একদিন এল যখন আর–একটা ধারা বন্যার মতো মনের মধ্যে নামল। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইল না। আমার কাব্যভূগোলে আর একটা দ্বীপ তৈরি হয়ে উঠল। মনের সেই অবস্থায় কখনো কখনো কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্যরূপ নিল।
>
> এ–সব লেখার ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, চিন্তার বিষয় এর মনস্তত্ত্ব। রচনার প্রবৃত্তি অনেক থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে, হঠাৎ কোনো–একটা প্রান্তে উদ্‌বোধিত হলে যারা ছিল অজ্ঞাতবাসে তারা যথোচিত সূত্রে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক–একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।
>
> ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেইজন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। সেই সময়ে এই বহির্দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে। এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যার রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।

'কথা' কাব্যগ্রন্থের সূত্রপাতে একটি কবিতা আছে যেটি কাব্যগ্রন্থের মূল সুরকে পরিস্ফুট করছে। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ অতীতকে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন, বলেছেন যে, অতীত কখনও হারায় না, সে তার কাজ করে চলতেই থাকে। বর্তমান সময়ের সফলতার জন্য এবং বর্তমান সময়ের কর্মকাণ্ডে প্রেরণার জন্য অতীতকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কবি বলছেন:

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে রও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত।
কথা কও, কথা কও।

'কথা' কাব্যগ্রন্থের উপকরণগুলো রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, রাজপুত, শিখ ও মারাঠীদের কাহিনী থেকে গ্রহণ করেছিলেন। মূলত এ সমস্ত উদাহরণ থেকে আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্তগুলো তিনি খুঁজে বের করেছিলেন। এখানে নতুন ভাবে কবি নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন। এ কবিতাগুলো তার নিজের কথা নয়, কিন্তু সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় কথা। অতীতে যে সমস্ত মানুষ আত্মত্যাগের সাহায্যে আপন জীবনকে মহিয়ান করেছিলেন সে সমস্ত মানুষের দৃষ্টান্ত আমাদের জীবনে যেন প্রেরণা স্বরূপ কাজ করে একথাগুলো কবি ভেবেছিলেন। প্রতিটি কবিতাই এক একটি ক্ষুদ্র অথচ দীপ্তিময় গল্পসত্তা। ইতিহাসের অধিকার থেকে এই কাহিনীগুলোকে তিনি জীবনের অধিকারে টেনে এনেছেন। প্রতিটি কবিতায় এক একটি তত্ত্ব আছে এবং তত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্যতা আছে। যেমন প্রথম কবিতার কথাই ধরা যাক। কবিতাটির নাম *'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'* । কাহিনীটি নিম্নরূপঃ একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তী নগরের পথে ভিক্ষা করছিলেন, ধনীরা ধন এনে দিচ্ছিল, শ্রেষ্ঠীরা রত্ন এনে দিচ্ছিল এবং বধূরা এনে দিচ্ছিল হীরা-মুক্তার কণ্ঠী। অনাথপিণ্ডদ তাঁর ভিক্ষার ঝুলিতে কোন কিছুই তুললেন না। বেলা শেষ হয়ে আসছে। নগরের বাইরের পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ এক ভিখারিণীকে দেখলেন। তার আর কিছুই নেই, গায়ে শুধু একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়া মেয়েটি সেই জীর্ণ চীরখানি প্রভুর নামে দান করলো। আনাথপিণ্ডদ বললেন--অনেকে অনেককিছু দিয়েছে কিন্তু সব তো কেউ দেয়নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্যদান মিললো, আমি ধন্য হলাম। সর্বস্ব দেয়ার মধ্যেই তো দেয়া, অন্যরকম দেয়ার মধ্যে স্বার্থবোধ থাকে। দ্বিতীয় কবিতাটির নাম *'প্রতিনিধি'* । এখানেও একটি তত্ত্ব আছে। রাজা তখনই যথার্থ

রাজা হতে পারেন যখন তিনি ভিক্ষুকের বেশে দরিদ্রের দ্বারে উপস্থিত হন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রাজা যখন ভিক্ষুকের প্রতিনিধি থাকেন তখন তিনি রাজ্য নিয়েও রাজ্যহীন থাকেন। অর্থাৎ রাজধর্ম পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্রের কল্যাণ করা এবং নৃপতি হিসেবে আপন গর্বকে বিনষ্ট করে কল্যাণব্রতে রাজ্য শাসন করা।

তৃতীয় কবিতা *'ব্রাহ্মণ'*। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে গ্লানি হোক, দুর্ভাগ্য হোক, সত্য প্রকাশে অকপট থাকা যথার্থ ধর্ম। যিনি সত্যাশ্রয়ী, তিনিই ব্রাহ্মণ। এভাবে প্রতিটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একটি করে অনুপম কাহিনী নির্মাণ করে সর্বশেষে একটি জীবন-তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন ঘটিয়েছেন। তত্ত্বগুলো স্বাভাবিকভাবেই কবিতার কাহিনীর মধ্য দিয়ে, রূপলাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে কোথাও অস্বাভাবিকতা নেই। *'মস্তক বিক্রয়'* কবিতাটি কাশীরাজ এবং কুশলরাজের তুলনামূলক ত্যাগের বিবরণ। এখানেও প্রথম কবিতাটির মত যিনি সর্বস্ব দিতে পারেন তিনি যথার্থ দিচ্ছেন—এই তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন ঘটেছে। *'পূজারিনী'* কবিতায় আপন বিশ্বাসের জন্য প্রাণ বিসর্জন করার কথা আছে। বিশ্বাসকে যদি প্রকাশই করতে না পারি তাহলে বিশ্বাস তো সততা-সিদ্ধ হয় না। বিশ্বাসের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা হচ্ছে, কোন প্রতিবাদে এবং বিমুখতায় বিশ্বাস সংকুচিত হতে পারে না। বিশ্বাস থাকবে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। *'অভিসার'* কবিতাটির মূল অর্থ হচ্ছে ঐশ্বর্যের এবং যৌবনের প্রতাপে অনেক কিছুকেই আমরা কাম্য করতে পারি, কিন্তু বেদনা এবং অসহায়তার মধ্যে কাম্যের ঋণ শোধ হয়। এর পরের কবিতাটির নাম *'পরিশোধ'*। *'পরিশোধ'*-এর মূল বিষয় হচ্ছে প্রেম। প্রেমকে সফল করবার জন্য প্রেমিক অথবা প্রেমিকা সর্বগ্রাসী মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারে। প্রেমের কাহিনী হিসেবে পরিশোধ একটি অনবদ্য রচনা। এই কবিতাটি অবলম্বন করে অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য *'শ্যামা'* রচনা করেছিলেন। *'শ্যামা'র* প্রকাশকালঃ ১৩৪৬। *'পূজারিনী'* কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ পরে *'নটির পূজা'* নামক নাটক রচনা করেছিলেন। *'পরিশোধ'* কবিতাটির মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সুন্দর প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে, যেমনঃ

> নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণবায়ুভরে
> তূর্ণস্রোতোবেগে। মধ্যগগনের 'পরে
> উদিল প্রচণ্ড সূর্য। গ্রামবধূগণ
> গৃহে ফিরে গেছে করি স্নান সমাপন
> সিক্তবস্ত্রে, কাংস্যঘটে লয়ে গঙ্গাজল।
> ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট; কোলাহল
> থেমে গেছে দুই তীরে; জনপদবাট

পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট,
সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাহার-তরে
কর্ণধার। তন্দ্রাঘন বটশাখা-'পরে
ছায়ামগ্ন পক্ষিনীড় গীতশব্দহীন।
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘ দিন।

অথবা,

গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে
অস্ত-অচলের ঘাটে, তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।
শুক্ল চতুর্থীর চন্দ্র অস্তগতপ্রায়,
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো; ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রীর মতো। প্রদীপ নিবায়ে
তরীবাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে
ঘননিঃশ্বসিতমুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা। পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম।

পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রনাথ যখন ছিলেন তখন থেকে নদীর সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা এবং নিবিড় আত্মীয়তা। *'সোনার তরী'* এবং *'চিত্রা'র* কবিতাগুলোর মধ্যে আমরা এর পরিচয় পেয়েছি। বিচ্ছিন্নভাবে *'কথা'র* কোন কোন কবিতায় নদীর পরিচয় ফুটে উঠেছে। নদীর বিক্ষুব্ধতা, নদীতে নৌকোর চলাচল, কখনও নদীর শান্তশ্রী, দ্বিপ্রহরের নদী আবার রাত্রির অন্ধকারের নদী—এ সমস্ত চিত্র আমরা বিক্ষিপ্তভাবে *'কথা'র* কোন কোন কবিতায় পাই।

'কথা' কাব্যগ্রন্থে তত্ত্বগুলো তত্ত্ব হিসেবে আমাদের চিত্রকে আকর্ষণ করে না, কাহিনীর বিন্যাসে এবং বক্তব্যের সততা-সিদ্ধিতে তা আমাদের অনভূতিকে স্পর্শ করে। কবিতাগুলোর ছন্দের লীলাময় ভঙ্গি, পয়ারের বিচিত্র কৌশল এবং বিবিধ পদবিন্যাস ভঙ্গি কবিতাগুলোকে আকর্ষণযোগ্য এবং আবৃত্তিযোগ্য করে তুলেছে। পয়ারের ব্যবহারে পদবিন্যাসের সাবলীল গতি আমদেরকে মুগ্ধ করে। এমন

সাবলীলতা, এমন নিশ্চিন্ততা বাংলা কবিতায় আমরা খুব কম দেখেছি। কবিতার রূপ–বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে সুস্পষ্ট করা খুব সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ সেই কাজে সুদক্ষ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি কবিতার যে ভাবলোক নির্মাণ করতে যাচ্ছেন তার জন্য *'কথা'* এবং *'কাহিনী'*র একটি বিশ্রাম রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন ছিল। তত্ত্বকে তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য বরীন্দ্রনাথের চিত্ত কাহিনী রূপ মূর্ছনায় আন্দোলিত হয়েছে। এর ফলে পাঠকরা একটি সচেতনতাকে প্রত্যক্ষ করছে। এই কবিতাগুলোর মধ্যে কোনরূপ আত্মকথন নেই, আত্মবিশ্লেষণ নেই, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করতে গেলে বলা যায় জীবনের কর্মপথে এবং অনুভূতির পথে যে বিশ্বাসগুলো তাঁকে সংবেদনশীল করেছিল তারই আনন্দিত প্রকাশ এই কবিতাগুলো। *'কথা'*র দু'একটি কবিতা বাদ দিলে অধিকাংশ কবিতাই ছোট বড় সকলেরই গ্রহণযোগ্য। অনেকগুলো কবিতার অবাধ ললিতভঙ্গি ছোটদের জন্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। *'কণিকা'*র তত্ত্বকথা প্রতিষ্ঠায় একটি ব্যর্থতা আছে, কিন্তু *'কথা'* কাব্যগ্রন্থে তার একটি বিপুল সফলতা আছে। *'কণিকা'*য় শুধু তত্ত্বকেই ধরে রাখা হয়েছে কিন্তু *'কথা'*য় আবেগের সারাৎসারের মধ্যে তত্ত্বগুলো সহজেই বিকশিত হয়েছে।

'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের সূত্রপাতে *'কথা'* কাব্যগ্রন্থের মত উৎস–সন্ধানী একটি কবিতা আছে। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথের পরিচিত জীবন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। *'কথা'*য় যেখানে প্রাচীন কাহিনী এবং ইতিহাস উৎস হিসেবে কাজ করেছে, *'কাহিনী'* তে তা নয়। *'কাহিনী'* র দুটো কবিতা বাদ দিলে সব কটি কবিতাই পরিচিত লৌকিক জীবনের আশ্রয়ে লালিত। সূত্রপাতের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, জীবনে কত ঘটনা ঘটে যে তার ইয়ত্তা নেই, সেগুলো আধারে এবং আড়ালে ছড়িয়ে থাকে। সেগুলো থেকে বেছে বেছে তিনি *'কাহিনী'* র কবিতাগুলো রচনা করেছেনঃ

কত কী যে আসে কত কী যে যায়
　　বাহিয়া চেতনাবাহিনী,
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত–
ছিন্ন সূত্র বাছি শত শত
　　তুমি গাঁথ বসে কাহিনী।
ওগো একমনা, ওগো আগোচরা
　　ওগো স্মৃতি–অবগাহিনী!

'কথা' কাব্যগ্রন্থে যেভাবে তত্ত্বের উন্মোচন আছে *'কাহিনী'* তে তা নেই। *কাহিনী'* তে শুধু গল্প বলার মুখরতা আছে। প্রথম কবিতাটি– **'গানভঙ্গ'** –এর কথাই ধরা যাক। রাজা প্রতাপ রায় সংগীতপিপাসু ছিলেন। তাঁকে গান শোনাতো বরজলাল। কিন্তু সময়ে সবই পরিবর্তন হয়, মানুষও বৃদ্ধ হয়। রাজা এবং বরজলাল উভয়ই বৃদ্ধ হয়েছেন। গানের আসরে এখন তরুণরা এসেছে। নতুন গায়ক কাশীনাথ সেখানে মধ্যমণি। কাশীনাথের গান রাজার ভাল লাগে না। বরজলালকে তিনি গাইতে বলেন। কিন্তু বরজলালের কণ্ঠে সুর ভঙ্গ হয়, শ্রোতারা হাসে এবং ব্যঙ্গোক্তি করে। তখন রাজা অনুভব করেন যে তাদের আর সময় নেই। সুতরাং তিনি বরজলালকে সঙ্গে নিয়ে উৎসব–গৃহ ত্যাগ করে চলে যান। কবিতার শেষের অংশটুকু অত্যন্ত মধুরঃ

একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে–
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কত তাল উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে–
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।

'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটিতে দরিদ্র এবং নিরহংকার একজন সাধারণ ভৃত্যের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মমতার সঙ্গে একজন সাধারণ ভৃত্যের পরিচর্যা এবং আন্তরিকতার ছবি উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পর্যায়ের রচনা। *'পোস্টমাস্টার'* গল্পে যেমন রতন অসুস্থ পোস্টমাস্টারের সেবা করতো এবং যে সেবার বিনিময়ে কোন প্রত্যাশা ছিল না, তেমনি *'পুরাতন 'ভৃত্য'* কবিতায় অসুস্থ মনিবকে ভৃত্য সেবা করে ভাল করে তুলছে। উভয় ক্ষেত্রে পরিণতি হচ্ছে বিচ্ছেদ। এক ক্ষেত্রে মৃত্যু বিচ্ছেদ আনছে অন্য ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হচ্ছে। *'পুরাতন ভৃত্য'* কে আমরা ছন্দোবদ্ধ ছোটগল্প হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। শিলাইদহ অবস্থানকালে কবিতাটি রচিত হয়েছিল। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিতে একটি সামাজিক ব্যবস্থার সমালোচনা আছে। উপেন বলে একজন দরিদ্র চাষীর জমি জমিদার অন্যায়ভাবে দখল করে নেন। উপেন তখন গৃহত্যাগ করে। অনেক পরে উপেন যখন ফিরে আসে তখন সে নিজের পুরনো বাগানে প্রবেশ করে। সে বাগান তখন জমিদারের অধিকারে থেকেও সে দ্বিতীয়বার বিতাড়িত হয়।

এই মর্মন্তুদ ঘটনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় একজন অত্যাচারী জমিদারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং একজন নির্যাতিত কৃষকের প্রতি মমতা প্রদর্শন করেছেন। এই কবিতার একটি অংশে দেশপ্রেমের মধুর ব্যঞ্জনাবহ কয়েকটি চরণ আছেঃ

নমো নমো নম সুন্দরী মম　জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর,　জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট　চুমে তব পদধূলি,
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়　ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন　রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল– নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ　জল লয়ে যায় ঘরে–
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।

'কাহিনী' র কবিতাগুলোর মধ্যে একটি নাটকীয় ভঙ্গি আছে। প্রতিটি কবিতার উন্মোচনীতেই একটি আকস্মিকতা এবং বিস্ময় আমরা আবিষ্কার করি যার ফলে পূর্ণ কবিতা পাঠে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়। *'পুরাতন ভৃত্য'* –এর পরিচয় সূত্রে প্রথম চরণ ক'টিতে যে চিত্রাংকন করা হয়েছে তা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ, আকর্ষণীয় এবং মমতাময়। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে চিনতে পারি এবং আপন করে নিতে পারি। তেমনি *'দুই বিঘা জমি'* তে একটি আকস্মিকতার ধাক্কায় আমরা চমকে উঠি এবং উপেনের ভাগ্য–অনুসরণে ব্যাকুল হই। এখানে ছন্দের সহজতা, অন্তঃযমকের নিশ্চিন্ততা পাঠককে মুগ্ধ করে।

'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি কাহিনীর গতিধারায় অত্যন্ত দীপ্ত এবং ক্ষিপ্র। এই গল্পটিতে কুসংস্কারের শাসনে একটি মানব–শিশুর ভয়ংকর মৃত্যু কবি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। গ্রামের লোকেরা তীর্থ স্নানের জন্য সাগর–সঙ্গমে যাচ্ছে। 'মৈত্র' নামক একজন ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রীদের নেতা। তাকে অনুরোধ করে বিধবা মোক্ষদা নৌকোর যাত্রী হল। কিন্তু তার ছেলে রাখালকে মাসীর কাছে রেখে আসতে পারল না। সে জোর করে নৌকোয় উঠল। মোক্ষদা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ফেলেছিল ''চল্, তোকে সাগরে ফেলে আসি''। এই কথাটি পরবর্তীতে মোক্ষদার জন্য কাল হল। তীর্থস্নান শেষে ফেরার পথে প্রবল ঝড়ের মধ্যে নৌকো পড়ল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন নর–নারী ভাবতে লাগল কেউ হয়তো দেবতার কাছে তার মানত পূর্ণ

করেনি তাই এই ঝড় উঠেছে। ব্রাহ্মণ তখন মোক্ষদার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল এই সেই রমণী যে পুত্রকে সাগরে দেবে বলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে তার মানত পূর্ণ করেনি। তখন সকলে রাখালকে মাতৃক্রোড় থেকে কেড়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। রাখালের অন্তিম আর্তস্বর শুনে ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয় হল। রাখালকে উদ্ধারের জন্য সেও সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাটকীয় তীব্রতায় এবং গতিধারায় *'দেবতার গ্রাস'* কবিতাটি একটি অনিন্দ্যসুন্দর উপাখ্যান। কবিতাটিতে সমুদ্রের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধতার একটি অপরূপ বিবরণ আছে। বাংলা কবিতায় সমুদ্র খুব কম এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামগ্রিক কাব্যকর্মে সমুদ্রকে খুবই কম ব্যবহার করেছেন। এখানেই লক্ষ্য করছি যে, সমুদ্রের বিবরণ অত্যন্ত সতেজ এবং সমীচীন হয়েছে:

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর-বায়ুর বেগ ক্রমে ওঠে বেড়ে।
রূপনারাণের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। 'তরণী ভিড়াও তীরে'
উচ্চকণ্ঠে বারংবার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর? চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা,
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধতবিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম।

'কাহিনী' তে *'বিসর্জন'* বলে একটি কবিতা আছে। সে কবিতাটির ঘটনাও 'দেবতার গ্রাস'-এর মত। জনৈকা কুসংস্কারাচ্ছন্ন রমণী অসুস্থ পুত্রের রোগমুক্তির জন্য দেবতার কাছে মানত করল যে সে তার পুত্রকে নদীতে বিসর্জন দেবে। দেবতা নিশ্চয়ই রুগ্ণ শিশুকে রোগমুক্ত করে তার ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করবেন। কিন্তু তা আর হল না। *'নিষ্ফল উপহার'* এবং *'দীনদান'* কবিতা দুটি পুরনো কাহিনী থেকে নেয়া এবং এই কবিতা দুটির তত্ত্বগত ব্যাখ্যা আছে। একারণে এ কবিতা দুটি *'কথা'* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সমীচীন ছিল। *'নিষ্ফল উপহার'* কবিতাটি *'মানসী'*

কাব্যগ্রন্থের প্রথম পাঠের সংশোধিত রূপ। এই কবিতাটির প্রথম পাঠে ছন্দের যে বিচিত্রতা ছিল তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য আছে:

> এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যথা--
>
> নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল;
> ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।
>
> 'নিম্নে' 'স্বচ্ছ' এবং 'ঊর্ধ্বে' এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস, যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; কেবল বাঙ্গালা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ-অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর-স্বরূপে গণনা করা যায় নাই--

তুলনামূলকভাবে *'মানসী'* -এর পাঠটি পাঠকের কাছে শ্রুতিসুখকর।

রবীন্দ্রনাথ *'কাহিনী'* নামে আরেকটি গ্রন্থ ভিন্নভাবে প্রকাশ করেছিলেন ১৩০৬ সালে। এটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে মূলতঃ নাট্য কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে। যেমন 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী,' 'নরকবাস,' 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। তবে নাট্যকাহিনী ছাড়াও নাটক নয় এমন দুটি কবিতাও এ গ্রন্থে আছে--যেমন,'পতিতা' এবং 'ভাষা ও ছন্দ'। এ দুটি কবিতার মধ্যে নাট্য-ভঙ্গি আছে, কিন্তু নাট্য-রূপ নেই।

'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যভঙ্গিতে এবং বিন্যাসে রচিত একটি আবেগপ্রবণ কবিতা। সংলাপের কৌশলের পূর্ণ বশংবদ না হয়ে কবি পাত্র-পাত্রীদের মুখে দীর্ঘ ভাষণ জুড়ে দিয়েছেন যা নাট্যভঙ্গির জন্য ক্ষতিকর। ক্ষতিকর হলেও এগুলোর পাঠ-যোগ্যতা আছে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'রেটোরিক', সেই রেটোরিকের বশ্যতা এই কবিতায় খুব প্রবল। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন অথবা গান্ধারী — এরা প্রত্যেকেই সুদীর্ঘ

ভাষণে জয়-পরাজয় সম্পর্কে এবং ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে দীর্ঘ তত্ত্ব-কথা উপস্থিত করছেন। কিন্তু তত্ত্বকথাগুলো অসৌজন্যমূলকভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয় না। সমগ্র কবিতার বেষ্টনীতে এগুলো প্রয়োজনীয়ভাবেই আবর্তিত হয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা। তৎসম শব্দের দীপ্ত বরাভয় এবং সাফল্যে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই সচেতন ছিলেন। তারই একটি রূপ আমরা এ কবিতায় পাচ্ছি। পয়ারের চৌদ্দ মাত্রার দৃঢ়বদ্ধতা এই কবিতার গতিবিধিতে একটি শালীনতা ও সম্ভ্রম এনেছে যে কারণে কবিতাটি পাঠকের কাছে একটি মহার্ঘ নিবেদন হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এই কবিতায় নানাবিধ তত্ত্ব পরীক্ষিত ও আলোচিত হয়েছে। এগুলোর একটি হল 'সুখ' এবং 'জয়'। জয়ী হলেই কি মানুষ সুখী হয়? আবার দুর্ভাগ্যকেও অনেকে সুখ মনে করে। এই তত্ত্বটির পক্ষে-বিপক্ষে ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন আলোচনা করেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে লোকধর্ম এবং রাজধর্ম নিয়ে আলোচনা আছে। গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের আলোচনা হয়েছে ধর্ম এবং অধর্ম নিয়ে। গান্ধারী ধর্মের বিজয় যাচঞা করেন এবং অধর্মের পরাজয় চান। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-স্নেহ এবং চিত্তদৌর্বল্যে একটি বিব্রত মানসিকতার শিকার হয়েছেন। তিনি ধর্মকে অস্বীকার করতে চান না। কিন্তু ধর্মের আদর্শকে পুত্রস্নেহের উপর স্থান দিতে পারছেন না। গান্ধারীর একটি বক্তব্যে তত্ত্বকথা আবেগের প্রহরায় গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থিত হয়েছে:

তবে আজ রাজপদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্যোধন
অপরাধী প্রভু! তুমি আছ, হে রাজন,
প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ--ভালোমন্দ
নাহি বুঝি তার; দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কত শত, পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে, মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল,
যে সেথা সঞ্চার করে ঈর্ষার গরল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে, পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ-' পরে

কলুষপরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ—পতি-সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ,
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।

অবশ্য কোথাও কোথাও শুধু তত্ত্বকথা এবং উপদেশই প্রাধান্য পেয়েছে, যেমন নীচের কয়েকটি চরণঃ

সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বৎসগণ! বায়ু হতে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা
করো লাভ দুঃখ ব্রত পুত্র মোর! রমা
দৈন্য-মাঝে গুপ্ত থাকি দীন-ছদ্ম-রূপে
ফিরুন পশ্চাতে তব সদা চুপে চুপে,
দুঃখ হতে তোমা-তরে করুণ সঞ্চয়
অক্ষয় সম্পদ।

'পতিতা' কবিতাটি আবৃত্তিযোগ্য একটি মনোরম কবিতা। এর মধ্যে গৌণভাবে নাট্যভঙ্গি বিদ্যমান। জনৈক তরুণ তাপসকে বিভ্রান্ত করার জন্য রাজমন্ত্রী কয়েকজন যৌবনবতী বারাঙ্গনাকে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু বারাঙ্গনারা তরুণ তাপসকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। বরঞ্চ তরুণ তাপসের নির্লোভ মানসিকতায় এবং পবিত্রতায় বারাঙ্গনাদের একজন রাজমন্ত্রীকে তাকে দেয় অর্থ প্রত্যর্পণ করছে। এ কাহিনীটিকে নিয়েই কবিতা। কবিতাটির সমগ্র প্রতিপাদ্য আরও কম পরিসরে প্রকাশ পেতে পারত। কিন্তু কথা বলার আনন্দে বিহ্বল কবি স্তব্ধ হতে চাচ্ছেন না। তাই ছন্দের অনাবিল স্রোতোধারায়, ধ্বনির তরল সুগম্যতায় একটি আবৃত্তির শ্রুতিসুখকর পাঠ নির্মাণ করেছেন। এই কবিতাটি 'চয়নিকা' নামক সংকলনে আছে। কিন্তু *'সঞ্চয়িতা'* থেকে এ কবিতাটি কবি বাদ দিয়েছেন। সম্ভবতঃ এই কবিতার দুর্বল আবেগপ্রবণতাই এর প্রধান কারণ।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির মধ্যে কবি একটি সত্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তা হচ্ছেঃ যা ঘটে তা সত্য নয়, যা কবি রচনা করেন তাই সত্য। কবিতার শেষের দিকে এই কথাগুলোই এভাবে বলা হয়েছেঃ

নারদ কহিলা হাসি, ''সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।''

রবীন্দ্রনাথ সত্য কাকে বলে এ সম্পর্কে কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনায় যা লিখেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যায় : ''তথ্য যাহাকে ইংরেজীতে fact বলে, তদপেক্ষা সত্য অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে মুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য, কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। সেই কারণেই কবিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। মহৎ ব্যক্তির কার্যবিবরণ কেবল তথ্যমাত্র, তাহার মহত্ত্বটাই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা 'অধিক।''

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনার প্রেরণা সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবেদন। একজন মহৎ কবি-চিত্তে একটি ভাব যখন জাগ্রত হয় সেই ভাবটি যতক্ষণ না শব্দরূপে বাঙ্ময় হচ্ছে ততক্ষণ তা বিধাতা প্রদত্ত অলৌকিক আনন্দের ভার হিসেবে চিত্তকে উদ্বেল করে:

—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথের 'সতী' নাট্যকাব্যটি বহুল প্রচারিত নয় এবং সে কারণে বহুল আলোচিতও নয়। কিন্তু এটি একটি অসাধারণ নাট্যকাব্য। এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবতার জয় ঘোষণা করেছেন। এই নাট্যকাব্যটি সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি সর্বসময়ের প্রতিবাদ। 'সতী' নাটিকাটির উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''মিস্ ম্যানিং-সম্পাদিত ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাক্‌ওঅর্থ সাহেব-রচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।'' 'সতী' র গল্পাংশ নিম্নরূপ: বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাই ভালবেসে একজন মুসলমানকে বিয়ে করে। অমাবাই-এর মাতা ম্লেচ্ছের সঙ্গে এই বিবাহকে অস্বীকার করেন এবং কন্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে অমাবাই-এর যবন স্বামী নিহত হয়। পিতা বিনায়ক তাকে হত্যা

করেন। পিতা তখন তার কন্যাকে যবনের ঔরসজাত শিশুপুত্রকে ত্যাগ করে আসতে বললেন। জীবাজি ছিল অমাবাই–এর বাগদত্ত। সেও সেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল। অমাবাইকে জীবাজির পত্নী হিসেবে বিবেচনা করে জীবাজির মৃতদেহের সঙ্গে তাকে সহমৃতা করা হল। সে সময় অগ্নিদাহনে জর্জরিতা অমাবাই একটি অক্ষয় বাণী উচ্চারণ করলঃ

জাগো, জাগো, জাগো ধর্মরাজ।
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু– জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব। তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যকাব্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে প্রেম কোন সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ মানে না। যথার্থ প্রেম লৌকিক নিয়ম লংঘন করে। প্রেম হল শাশ্বত মানবধর্ম। লৌকিক ধর্মে যেখানে জাতি–বর্ণ বিচার আছে প্রেম ধর্মে তা নেই। প্রেমের এই শাশ্বত ব্যঞ্জনার অধিকারে অমাবাই মুসলমানের পত্নী হয়েও যথার্থ সতী।

'নরকবাস' এই কাব্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাট্যবন্ধ কবিতা। এখানেও *'সতী'* নাট্যকাব্যের মত একই সত্য প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও লৌকিক ধর্মের চেয়ে মানবধর্মকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। রাজা সোমক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে পিতৃধর্ম পালন করেননি। নিজ পুত্রকে মঞ্চে আহুতি দিয়ে মহা পুণ্য অর্জন করে, স্বর্গে চলেছেন। তিনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যে বাক্যরক্ষা তা পালন করে যশস্বী এবং সে কারণে লৌকিক ধর্মের বিচারে তিনি পুণ্যাত্মা। স্বর্গের পথে ঋত্বিকের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হল। ঋত্বিক 'নরকবাস' করছিলেন। রাজার তখন মনে পড়লো, ঋত্বিক যে পাপে পাপী তিনিও তো সেই পাপে পাপী। সুতরাং স্বর্গে যাবার অধিকার তো তারও নেই। তিনি স্বর্গের অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নরকবাসকে গ্রহণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় মানবধর্মকেই যথার্থ হিসেবে নিরূপিত করেছেন।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' একটি কৌতুক নাটিকা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এবং উপস্থাপনার দিক থেকে নাটিকাটি কাহিনীকাব্যে গ্রন্থিত না হলেই ভালো হত বলে

মনে হয়। এটি এককভাবে একটি কৌতুক নাটিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে পারত। নাটিকাটির বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি স্বপ্নের কাহিনী। রানী কল্যাণী একজন দানশীলা রমণী। যেমন ধর্মপ্রাণ তেমনি কল্যাণব্রতী। যারাই প্রত্যাশার হাত বাড়িয়ে তার সামনে উপস্থিত হচ্ছে তারই ইচ্ছা তিনি পূরণ করছেন। রানীর গৃহে কর্মরতা দাসী ক্ষীরোর এটা সহ্য হয় না। সে নিজেও সুযোগ-সুবিধা নেয়, কিন্তু অন্যের প্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিতা হয়। প্রতারণাই তার মূলধর্ম। সে একদিন ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর কাছে ভাগ্য পরিবর্তনের কামনা করল। অর্থাৎ সে যেন রানী হয় এবং রানী যেন দাসী হয়। তাই হল। কিন্তু চরম বিশৃংখলা ঘটল এবং ক্ষীরো অবস্থার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারল না। এই দৃশ্যগুলো স্বপ্নের। পরে যখন স্বপ্নভঙ্গ হল তখন ক্ষীরো বলল যে রানী হওয়াটা তার ঠিক হয়নি। তার পক্ষে চিরদাসী হওয়াটাই মঙ্গলের। এই কৌতুক আবহাওয়ার নাটিকাটির মধ্যে কাব্যভাবের কোন প্রশ্রয় নেই। প্রবল ঠাট্টা এবং পরিহাসের ভঙ্গিতে নাটিকাটি রচিত। নাটিকাটির ভাষা সহজ এবং চটুল। এ নাটিকাটির ভাষা ও রচনারীতি সরল-সরস এবং হাস্যোজ্জ্বল। বহু দেশজ শব্দ কবি এখানে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। ছন্দের মধ্যে দ্রুত গতি ও চটুলতা আছে।

'কাহিনী' গ্রন্থের সর্বশেষ নাট্যকাব্য *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ*। এই নাটিকাটি দীপ্ত, কঠোর এবং তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রাখর্যে উজ্জ্বল। কর্ণ ছিলেন কুন্তীর অবৈধ সন্তান। কুন্তী লোকভয়ে এবং সমাজ-ভয়ে তার মাতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে কর্ণকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই কারণে কর্ণ ক্ষুব্ধ এবং বিদ্রোহী হয়েছিলেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে কর্ণ কুরু-পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে কুন্তী এসেছিলেন কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে টেনে আনতে। কুন্তী তার মাতৃত্বের অধিকার নিয়ে কর্ণকে পাণ্ডব-পক্ষে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কর্ণ সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন:

> সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ-
> তাহারে দিতেছ, মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস।
> একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
> সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
> মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
> এক মুহূর্তেই, মাতঃ, করেছ নির্মূল
> মোর জন্মক্ষণে। সূতজননীরে ছলি

আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি,
কুরুপতি—কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন ক'রে যাই যদি রাজসিংহাসনে,
তবে ধিক্ মোরে।

আমরা এখন আলোচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর বিশিষ্টতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব :

'কণিকা' কাব্যগ্রন্থের মূল তাৎপর্যগুলো নিম্নভাবে উপস্থাপন করা যায়:

১. সংসার জীবনের কর্মকাণ্ডে জটিলতা এবং বিরূপতা থেকে উদ্ভূত অকল্যাণের পটভূমিতে এই কবিতাগুলো রচিত এবং সেই হিসেবে এগুলোতে ব্যঙ্গোক্তি, কটূক্তি এবং চটুল তত্ত্বকথা এসে উপস্থিত হয়েছে।

২. *'কণিকা'* র কবিতাগুলোয় ইচ্ছাকৃতভাবে কবি কোন কাব্যভাবের প্রশ্রয় রাখেননি।

৩. শিলাইদহে অবস্থানকালে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় ঘটেছিল সে পরিচয়ের ইঙ্গিতবহ অনেক শব্দ একাব্যগ্রন্থে – আমরা পাচ্ছি। যেমনঃ কাস্তে, লাঙ্গলের ফলা, কুমড়ো, খোঁপা, এলোচুল ইত্যাদি। গ্রামীণ পরিমণ্ডলে বশংবদ মানুষগুলোকে এখানে আমরা পাই।

'কথা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আমরা যে বিশদ অভিব্যক্তিগুলো পাই তা নিম্নরূপ:

১. 'কথা'র কবিতাগুলোকে উপদেশমূল ক অথবা তত্ত্বভিত্তিক বলা যেতে পারে। কিন্তু এমনভাবে কবিতাগুলো লিখিত হয়েছে যে তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্যই তা লিখিত হয়েছে তা মোটেই অনুভব করা যায় না। কাহিনীর গতি ধারায় এবং সঞ্চারিত প্রবাহে তত্ত্বগুলো স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হয়েছে।

২. 'কথা'র কবিতা গুলো গীতিকাব্য নয়, কবি নিজেকে এখানে উপস্থিত করেননি। জীবন চেতনার বিভিন্ন সাফল্য নিজস্ব বিকাশে কবিতাগুলোয় রূপ পেয়েছে।

৩. 'কবিতাগুলোর ভাষা সরল, ক্ষিপ্র এবং ছন্দের আবর্ত আবৃত্তিযোগ্য।

'কথা' র সম্পূরক গ্রন্থ হিসেবে *'কাহিনী'* নামক যে গ্রন্থটি পাই সে সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবেচনা উপস্থিত করা যেতে পারেঃ

১. পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে এ কাব্যের উপ করণগুলো গৃহীত হলেও এর মধ্যে সকল মানুষের বেদনা ও দুঃখদাহনের চিত্ত উন্মোচিত হয়েছে।

২. ছোটগল্প রচনাকালে এই কবিতাগুলো রচিত হয়েছিল। তাই এখানে বাংলাদেশের প্রকৃতি, নদীমাতৃক জীবন এবং পল্লী– পরিবেশ সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

৩. কবিতাগুলোর উপস্থাপনা কৌশলে নাটকীয় ভঙ্গি বিদ্যমান যার ফলে একটি গতিময়তা নির্মিত হয়েছে।

'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর যে কথাগুলো অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে আমাদের মনে ভাসে তাহলোঃ

১. তৎসম শব্দের ধ্বনি মাধুর্য, বাক্যের অন্বয় শৃংখলা এবং কঠোর অথচ সচল গতিবিধি কবিতাগুলোকে মহিমান্বিত করেছে।

২. নাট্য কবিতাগুলো আবৃত্তি–অভিনয়ে মনোজ্ঞ। কবি সংলাপের গুরুত্ব বিনষ্ট না করে আবৃত্তির মহাবিষ্টতার সাহায্যে একটি গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণ করেছেন।

৩. কবিতাগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, আন্তরিকতা এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিশূন্য মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।